(সা র প ত্র ক)

লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা

পি এইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

দেবরাজ দাশগুপ্ত

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা : ACSSS1100216 / 2015-16

তত্ত্বাবধায়ক : ডঃ অনির্বান দাশ

অধ্যাপক, সংস্কৃতিবিদ্যা

সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালক্যাটা

সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

সারপত্রক

লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা

'লেখার কাজ' – বিষয়টিকে আমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তথাপি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে, এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, ক্রমে আমাদের গবেষণায় – লেখার কাজের একটি সাধারণ ধারণার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। যেহেতু লেখার কাজের ধারণা – কাজের ধারণার সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত – তাই সেখান থেকে, আরও বৃহৎ আরেকটি ধারণা – যাকে আমরা 'কাজ' বলি – সেই বিষয়েও মোটের উপর মৌলিক কোন দাবিতে পৌঁছানো যায় কিনা – সেটারও প্রচেষ্টা করেছি। যদিও 'কাজ' নয়, 'লেখার কাজ'-ই আমাদের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। লেখার কাজকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অনেক ধরণের পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে পারে - আমার ক্ষেত্রে, 'লেখার কাজ' কি? এই প্রশ্নটি - সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়াটিকে জানবার তাগিদ থেকে উঠে আসা একটি প্রশ্ন। সেক্ষেত্র সাহিত্যিকের মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে - সাহিত্যের দর্শন, লেখকদের ব্যক্তিগত লেখা, লিখনের দর্শন, শ্রমের দর্শন - সাধারণ অর্থে সাহিত্যের দর্শনের ধারণাগত ইতিহাস এবং একই সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস – এই সবকিছুকে একত্রে আলোচনা করার একটি প্রচেষ্টায় আমরা নিযুক্ত হয়েছি। সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা একটা কাজের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই এমন একটি রেখা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছি - যেখান থেকে দেখলে, সবকটি দিককেই প্রায় আলোচনা করা যায় – অর্থাৎ সহজ কথায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার চেষ্টা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, বাংলার ও বিদেশের চিন্তকদের তুলনামূলক ভাবে পাঠ করার চেষ্টা – সবটুকুই যেন একত্রে সম্ভবপর হয় – সে বিষয়ে আমরা সজাগ থেকেছি। তুলনামূলক পাঠের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন – কোন সাহিত্যিক পাঠ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যদি কোন সমালোচক দেশী বা বিদেশী দর্শন বা তথাকথিত 'তত্ত্ব' ব্যবহার করেন – সেই ব্যবহারের নানাবিধ রকমফের হতে পারে । কেউ মনে করতে পারেন তত্ত্বের ভার পাঠ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া বা পাঠ্যকে তত্ত্বের সঙ্গে যথাযথ খাপ খাইয়ে নেওয়াই তত্ত্ব-প্রয়োগের একমাত্র লক্ষ্য আবার কেউ মনে করতেই পারেন, তত্ত্ব এবং কোন একটি পাঠ্যের ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ ঠিক এক ধরণের চর্চা নয়। প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও পাঠ্যের আলগা মিশ্রণ থাকবে, তেমনটাই বাস্তবিক। কোন একটা তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে একটি পাঠ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সমালোচকের কাজ নয় বলেই আমাদের মনে হয়। তত্ত্ব ও পাঠ্যের তুলনামূলক আলোচনায় যে ভাবনা-সূত্রগুলি, যে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলি উঠে আসছে, সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করাই গবেষকের কাজ। তত্ত্বের প্রয়োগ তত্ত্বকে প্রমাণ করার হাতিয়ার কি? নাকি তত্ত্বের প্রয়োগ আসলে, কোন চিন্তার বা বোধের আরেক রকমের উন্মোচন। এই দ্বিতীয় অর্থেই যে কোন দর্শন বা তত্ত্বের প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি আমরা। গবেষণার যে প্রধান প্রশ্ন – 'লেখার কাজ কী?' – সেই প্রশ্নের উত্তরে হয়ত পরিশেষে আমরা অন্যান্য গভীর প্রশ্নের দিকে সরে গেছি, সেটাই বোধ করি যেকোনো গবেষণার পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

‘লেখার কাজ’ শব্দ দুটি পাশাপাশি যেন কিছুটা ধন্ধ উদ্রেককারী। লেখা তো নিজেই একটি কাজ, তাহলে লেখার কাজ বলে কি আদৌ কিছু হয় ? লেখা (যা আমাদের আলোচনায় প্রায়শই ‘লিখন’ হিসেবে ব্যবহৃত) আসলে, নানাবিধ দার্শনিকের আলোচনায় সামান্য একটি কাজের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব বহনকারী একটি ধারণা কিন্তু লেখা কি আদৌ আসলে কোন অসামান্য কাজ? সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধানত প্রচলিত মত হল - লেখা অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টি অর্থে লেখা আসলে অলৌকিক ঘটনা। মজুরের কায়িক কাজের তুলনায় লেখা একটি ভিন্ন ও উঁচু স্তরের কাজ। এই ধরণের মতামতের প্রেক্ষিতে সাহিত্যিকদের এরকম উচ্চশ্রেনীধর্মী মতামত প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পরিসরে অসম্মানিত এবং সমালোচিত হতে হয়। মতটি সত্যিই সমালোচনার যোগ্য কিন্তু - ঠিক কি কারণে, সাহিত্য-সৃষ্টির কাজকে মহিমাময় লেখালিখির কাজ বলে মনে করা হয়ে থাকে আর কি কারণে অন্যান্য কাজকে তেমনটা মনে করা হয়না ? এই তফাতের মধ্যে কি সত্যি কোন বিচারযোগ্য যুক্তি আছে? আলোচনা করার মত বিতর্ক আছে? এই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করলে - লেখকের প্রতিভা, সাহিত্যিকের ঐশ্বরিক, অতিলৌকিক, উত্তরণধর্মী অনেকানেক পবিত্র অভিজ্ঞতা – ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানতে পারি। মোটা দাগে আলোচনা করলে, সাহিত্যিকদের কাজ বড় বেশি অতিলৌকিক, ঐশ্বরিক এবং যেহেতু এসকল সাধনার বিষয় - ফলত সকলেই সাহিত্যিক হওয়ার যোগ্য নয়। প্রকৃত অর্থে লেখা যেকোনো কর্মীদের সাধ্যের বিষয় নয়। মোটের উপর এরকম আলগা একটি যুক্তি দিয়েই লেখালিখির মাহাত্ম্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কাজ করে থাকে বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং কেবল লেখা নয় - সাধারণ অর্থে শিল্প, সঙ্গীত সব ধরণের শৈল্পিক কর্মের ক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে এই ধারণা চালু আছে। এই ধারণাটিকে যদি প্রশ্নহীন ভাবে মেনে নিতে না হয় - তাহলে এই ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রশ্নকে দাঁড় করানো প্রয়োজন। ঠিক কোন কোন উপাদান দিয়ে লেখার কাজ বিষয়টি গঠিত বা লেখার কাজ ঠিক কোন ধরণের ধারণামূলক সমীকরণের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়া করে থাকে?

লেখার কাজের প্রধানত দুটি দিক, একটি হল প্রকাশ এবং অপরটি হল সম্বন্ধ। এই দুটি দিককে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা চলে, বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, নানাভাবে দুটি দিককে প্রকট ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকাশ যখন নির্দিষ্ট-রূপে সম্বন্ধে উপনীত হতে সক্ষম হয় - তখন যেন এক অর্থে লেখার কাজ তার পূর্ণতা লাভ করে। কার প্রকাশ? লেখক - লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সূত্রে তার পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হয়। পাঠক সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে সম্পর্কিত করবার প্রয়াস করেন এবং সেই সূত্রে যেনবা তিনি লেখকের সঙ্গে একভাবে সম্পর্কিত হন। এই প্রকাশ ও সম্বন্ধের খেলা, অবভাস বিদ্যার পরিভাষায় আত্ম ও অপরের সম্বন্ধের সন্দর্ভ। কিন্তু প্রকাশ ও সম্বন্ধের কোন নিয়ম বা কোন গত আছে কি? কোন একটি পথ ধরে চললে তবে এই কার্য সফলরূপে সম্পন্ন হবে? কোন সমীকরণ আছে কি? না, তেমন কোন নির্দিষ্ট মার্গ নেই। প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ আলোচনা আছে, মতান্তর আছে, দর্শন, তর্ক, বিতর্ক আছে। এই ধরণের আলোচনাগুলিকে আমরা, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব বা শিল্প-তত্ত্ব বলে থাকি। এই সকল আলোচনার মধ্যেই প্রধানত সাহিত্য ও শিল্পের যাথার্থ্য বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাকে সাহিত্য বলব,

কাকে বলব না, কোন লেখা সাহিত্য এবং কোন লেখা সাহিত্য নয় – তার মূল ভিত্তিই হচ্ছে, এই ধরণের সমালোচনার মহাফেজখানা।

তাহলে অন্যদিক দিয়ে দেখলে, সাহিত্য রচনার কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পাচ্ছি, যা অন্যকাজের ক্ষেত্রে আছে কিনা সেটা বোঝা যাচ্ছেনা। সাধারণ রোজকার সাহিত্যের ধারণায় – সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিকের কাজের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই – সেই পার্থক্যের কিছু ভিত্তি উপরের আলোচনায় খানিকটা আছে। এই ধরণের বিশেষত্ব সূচক অনিশ্চয়তার সূত্র ধরেই, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে লেখকের এমন একধরণের সমস্যার দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার থেকেও বড় কথা, সেই সমস্যাটি নিজেই, অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্নের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়। সমস্যা হল সাধারণ অর্থে - শ্রমের মূল্য পরিমাপ বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে, একজন চাষি বা মজুর এমনকি একজন কেরানীর শ্রমকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করে ফেলা সম্ভবপর হলেও, একজন শিল্পী বা লেখকের শ্রমকে কি মেপে ওঠা সম্ভব হচ্ছে? কারণ তার সাহিত্যিকের শ্রমের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা আগেই অনুমান করতে পারছি – যা অন্য কাজে নেই। তাহলে একটি পরিমাপ বিজ্ঞান দিয়ে দুধরণের কাজকে বিচার করছি কেমন করে? অন্য দিক দিয়ে ভাবলে, সাহিত্য বা শিল্পের কাজের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য পরিমাপের যে সমস্যা – সেই সমস্যা কি আসলে, সার্বিক অর্থে কাজের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য পরিমাপের যে বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতাকেই প্রশ্ন মুখে ফেলছে? তাহলে সেই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে কিভাবে বৃহত্তর অর্থে কাজের দর্শন বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি আমরা? অথবা প্রকারান্তরে, 'লেখার কাজ' বিষয়ে, আরও কিছুটা নিশ্চিতভাবে কয়েকটি ধারণায় উপনীত হতে পারি। এই চিন্তার অনুষঙ্গেই, একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে আসে – তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে সক্ষম হই – কোন লেখাটি প্রকৃত সাহিত্য এবং কোনটি অসাহিত্যিক লেখা? সমস্ত লেখার মধ্যেই কি তাহলে সাহিত্য হয়ে ওঠার বা – লেখার সংকীর্ণ ব্যবহারিক সীমানা অতিক্রম করে বৃহৎ পরিসরে উন্মীলিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়?

যে বিষয়ে আমরা আপাতত চিন্তিত হচ্ছি, সেই সম্ভাবনা - যদি তাকে একধরণের অসম্ভাব্যতা হিসেবেও চিহ্নিত করি – তার প্রতি সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রেও - সেই পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একইসাথে লেখকের বেশকিছু গুণাগুণ ও অভ্যাস ও মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে? নানাবিধ ব্যাখ্যায় তা নানারকম -সন্দেহ নেই। কিন্তু একভাবে দেখলে - একটি বিশেষ ধরণের সচেতনতা বা প্রস্তুতি ছাড়া কি আদৌ লেখক হওয়া সম্ভব, সাধনা ছাড়া কি সাহিত্য আদৌ সম্ভব? এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে - অনেক সময়, নানামুণির নানা মত আমরা দেখতে পাই। কেউ কেউ বলেন - লেখকের যদি যথাযথ জীবন-অভিজ্ঞতা, জীবন-যাপন, যাপিত-অভিজ্ঞতা না থাকে – তাহলে তার পক্ষে সাহিত্য লেখা অসম্ভব। বাজারি কিছু উৎপাদন করে, ফাটকা হাততালি পেলেও, সেই লেখা আসলে সাহিত্য হতে পারেনা। আবার কেউ কেউ মনে করেন - বাজার কি একেবারেই বাতিল করে দেওয়ার জিনিস ? বাজারে প্রতিষ্ঠা না পেলে, ব্যক্তিগত ভাবে কে কি লিখল, তা ডায়েরি হতে পারে কিন্তু তা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারেনা। একটা বিশেষ মানের, বিশেষ মাত্রার লেখা না হলে – বাজার কখনই তাকে স্বীকৃতি দিতে

পারেনা। কেউ কেউ মনে করেন, অভিজ্ঞতা দিয়ে আদৌ লেখা হয়না, আসলে সবই - লেখার গণিত, আঙ্গিক গত, সাহিত্যের রূপ-রীতি গত ব্যাপার – সেসব না জেনে, সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে সচেতন না হয়ে লিখতে গেলে, কখনই যুগান্তকারী সাহিত্য রচনা - সম্ভবপর নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন - লেখা কি আর কেউ ইচ্ছে করে লিখতে পারে – লেখা আসে বা লেখা আসলে অলৌকিক কৃপার ফলাফল। সৃষ্টি আসলে - অনেকটা প্রসব বেদনার মতন – না সৃষ্টি করলে সেই বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়না।

একেবারে সাধারণ ভাবে ভাবলে, লেখা তো আর পাঁচটা কাজের মতই একটা কাজ, কেরানীদের মতই লেখকেরা কাগজে বা টাইপরাইটারে কিংবা কম্পিউটারে বসে বসে লেখেন - সেই লেখা অন্তর্জালে বা দোকানে প্রকাশিত পুস্তক আকারে বিক্রি হয় এবং সেটা একজন পাঠক দাম দিয়ে কেনেন, তারপর চোখ দিয়ে পাঠ করেন – মোটাদাগে এর বেশি আর কোন কিছু হয় বলে সচরাচর শোনা যায়না। তাহলে কি সত্যিই লেখকের নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা থাকে - যা অ-লেখকদের থেকে ভিন্ন? তাহলে অভিজ্ঞতা ছাড়া কি লেখা হয়না?

আমাদের গবেষণায় এই প্রশ্নগুলিকে আমরা স্বাভাবিক ভাবে মূল কয়েকটি ধারণায় ভেঙে নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রথমত – লেখকের অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়ত - সাহিত্যের সংরূপ। তৃতীয়ত – সম্বন্ধ বা সাহিত্যের মূল্য। চতুর্থত – ভবিষ্যচেতনা বা জীবনদর্শন বা নীতি-রাজনৈতিকতা। প্রধান বক্তব্যটি খুব পরিষ্কার – লেখার কাজ একটি ‘কার্য-ঘটনা’, যা সম্পূর্ণরূপে লেখকের অভিজ্ঞতার উপরেও নির্ভর করেনা – আবার অন্যদিকে লেখার আঙ্গিক বা সংরূপ বা রীতির উপরেও নির্ভর করেনা। সাহিত্যিক তার লেখার কাজের মধ্যে দিয়ে - লেখার সংকীর্ণ অর্থনৈতিক সীমানাকে লঙ্ঘন করে – লিখনের সাধারণ অর্থনীতির দিকে ধাবমান হয় এবং তার এই কাজের মধ্যে সে সাহিত্যের এককত্ব এবং তার দার্শনিক সামান্যতার ধারণা কোনটিকেই সে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে যায়না – সাহিত্যের এককত্বের মধ্যে দিয়েই যেন দার্শনিক সামান্যতার উন্মোচন চলে তার কাজে। এই কাজকে যেহেতু লেখকের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে ফেলা চলেনা, সেই হেতু এ যেন একধরনের অনভিজ্ঞতা, অসম্ভাব্যতা। আবারও বলি – ঠিক এই কারণেই লেখার কাজকে লেখকের অভিজ্ঞতা বা সাহিত্যের বা লেখালিখির সংরূপ, রীতি, কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধরে ফেলা বা বেঁধে ফেলা সম্ভবপর হয়না - লেখকের শ্রমের পরিমাপ - একভাবে পরিমিত হয়েও থেকে যায় অপরিমেয়। সেই ধারণাকে স্মরণে রেখেই আমাদের গবেষণার মূল বক্তব্য লেখার কাজ আসলে শ্রম-সময়ের একধরণের অ(ন)ভিজ্ঞতা। যে অ(ন)ভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত, সংকীর্ণতা থেকে উন্মীলন এবং নীতি-রাজনীতি, জীবনদর্শন তথা ভবিষ্যচেতনার প্রশ্ন। লেখকের আত্মের উন্মোচন এবং অপরের তরে কর্তব্যপরায়ণ ও নিমন্ত্রক বা আহ্বায়ক হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ। সচেতন জীবনদর্শন বা জীবন-অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখক হওয়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও তার প্রকাশেই লেখার কাজ থেমে থাকেনা, অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা ও কাজের সংকীর্ণ সীমানাকে লঙ্ঘন করে অপরের প্রতি আহ্বায়ক হয়ে ওঠা এবং অবশেষে যেন একভাবে অপরের সঙ্গে অসম্ভব সম্বন্ধে মিলিত হওয়ার মধ্যে দিয়েই লেখার কাজ - সাহিত্য সৃষ্টির কাজের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

প্রথম অধ্যায়ে, আমরা প্রধানত আমাদের গবেষণার শিরোনামটিকে ('লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা) যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন-পত্রাবলী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথমে দেখাতে চেষ্টা করব - কিভাবে লেখার কাজ আসলে প্রকাশ ও সম্বন্ধ –এই দুটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ এবং মানিক আলোচনার অনুষঙ্গেই আমরা আলোচনা করব – ঘটনা হিসেবে লিখনের তাৎপর্য। অমিয়ভূষণ মজুমদার তার 'লিখনে কি ঘটে' গ্রন্থে লিখন, সংবিত্তি (Communication) এবং নীতির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং সেই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ এবং মানিক আলোচনার অনুষঙ্গেই আমরা আলোচনা করব – ঘটনা হিসেবে লিখনের তাৎপর্য। অধ্যায়ের অন্তে - আমরা ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার লিখন-দর্শন বিষয়ে আলোচনা করব। বিশ্বের তাবৎ দর্শণচর্চার ইতিহাসকে স্মরণে রেখেই বলা চলে - দেরিদা একমাত্র দার্শনিক যার দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে, লিখনের তর্ক। আমাদের মতে লিখন বিষয়ক যে কোন - আলোচনার দার্শনিক অঙ্গ হিসেবে দেরিদার দর্শন অপরিহার্য। সেই হেতু দেরিদা কিভাবে লেখালিখির সাধারণ ধারনা থেকে লিখন –কে একটি ব্যাপক দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করব আমরা। দেরিদার দর্শনের সঙ্গে আমাদের গবেষণার সম্বন্ধ বিষয়েও আলোচনা করব এবং ক্রমে আমরা লক্ষ্য করব কিভাবে আমাদের আলোচনা আমাদের গবেষণার মূল প্রশ্নটিকে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করে তোলে। মূল প্রশ্ন যার কথা আগেও বলেছি, এখানে আরেকবার লিখছি – "কাকে বলি লিখনের শ্রম : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা" – এই আমাদের মূল প্রশ্ন ও গবেষণার শিরোনাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হল – লিখন বিষয়ে আমরা যে তর্কটি তুলছি – সেটি কি কেবলমাত্র দু'এক জন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কোন আলোচনা নাকি, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যেভাবে লেখালিখিকে চিন্তা করা হয়েছে, সাহিত্যিক মূল্যকে চিন্তা করা হয়েছে – তার সঙ্গে আমাদের গবেষণার তর্কটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ? সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব মূলত বাংলায় লিখিত সাহিত্য - সমালোচনার ইতিহাসকে সামনে রেখে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসবে দেরিদীয় সাহিত্যের-দর্শন - দেরিদীয় চিন্তাবিদ ডেরেক অ্যাট্রিজের সাহিত্য ও সৃজন-চিন্তার সূত্রে আমরা আমাদের গবেষণার আলোচনাগুলিকে পাঠ করার চেষ্টা করব।

তৃতীয় অধ্যায়, আমরা শুরু করব ঠিক সেই সাহিত্যের মূল্যের তর্ক থেকেই – রবীন্দ্রপন্থী আবু সয়ীদ আইয়ুব ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যেকার বিতর্ক থেকে আমরা বুঝতে চাইব – সাহিত্যের মূল্য ও ভবিষ্যতের সম্পর্ক - লেখকের জীবনদর্শন ও ভবিষ্যতের সম্পর্ক। এই অধ্যায়ে সাহিত্যের মূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরব শ্রমের মূল্য আলোচনার প্রসঙ্গে। কিভাবে নানাবিধ শ্রম, শ্রমের নানাবিধ মূল্য – সাহিত্যিক মূল্যের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত – সেটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব আমরা। পরিশেষে, তিনটি অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে – বাংলা

সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন লেখকদের নিজস্ব লিখন বিষয়ক আলোচনা থেকে পুনরাবিষ্কার করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের লেখার কাজ বিষয়ক সমগ্র আলোচনাটিকে সমাপ্ত করব।

আমাদের গবেষণার বিভিন্ন অংশে - একটি প্রশ্ন বার বার উঠে আসে - যে বক্তব্যটি দিয়ে আমরা - আমাদের এই লেখা শুরু করেছি – অর্থাৎ লেখার কাজ বিষয়ে আমরা যেসকল সিদ্ধান্ত খুঁজে পেতে পারি – সেগুলিকে কি সাধারণ ও বৃহৎ অর্থে কাজের ধারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে করা যায়? এই উত্তরে আমরা এটুকুই ভাবতে পারি - ঠিক নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নয়, কেবল কয়েকটি অনুমানকে – গবেষণার সামগ্রিক আলোচনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে - উপসংহার অংশে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। যদি সেই সব সূত্র ধরে কিংবা আমাদের গবেষণার যেকোনো কিছুর সূত্র ধরেই নতুন কোন গবেষণার পথ প্রস্তুত হয় – তাহলে আমরা বুঝব - আমাদের গবেষণা লেখার কাজটি কিছুটা সফল হয়েছে।